দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 APR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

ল্যাবরেটরী নেই, বই নেই, শিক্ষক নেই—বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে

হাসান হাফিজ ঃ নরসিংদীর ঘোড়াশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কোন ল্যাবরেটরী নেই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দী অবস্থায় লাইব্রেরী রুমে পড়ে আছে। '৮৯ সালে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত এইসব যন্ত্রপাতির বাক্স আজো খোলা হয়নি। কবে যে খোলা হবে সে ব্যাপারে বিজ্ঞান শিক্ষকরা অনিশ্চিত।

বিজ্ঞান শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেন অকপটে বললেন, প্র্যাকটিকাল ক্লাস যা নেয়া হয় তা এসএসসি পরীক্ষার ঠিক আগে আগে। ৪/৫টি নির্দিষ্ট এক্সপেরিমেন্ট কোনমতে শেখালেই চলে যায়।

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইয়ের রায়দক্ষিণ কোহিনূর মেমোরিয়াল হাইস্কুল। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী বললেন, গাইডের দাপট এত বেড়ে গেছে যে আমাদের পড়ানোর দরকার নেই। পরীক্ষার সময় টয়লেটে বস্তা বস্তা নকল জমে। লটারি তো, ১০টা নেয়-দুটো কমন পড়ে।

একই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক নূরুল ইসলাম মোল্লা ৯০ সালে নিয়েয়ার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বললেন, পড়াই স্কুলে, ট্রেনিং দিয়েছে ডিগ্রী পর্যায়ের। প্রশিক্ষণ কোন কাজেই আসেনি।

ঘোড়াশাল পাইলট হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক বিজয় আঢ্য। এলোমেলো ছড়ানো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখিয়ে বললেন, সিলেবাসে এসবের কিছুই নেই। আছে বীজের অঙ্কুরোদগম-দেখাতে হলে কয়েকদিন ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেই বসে থাকতে হয়। অন্য ক্লাস আর হবে না। সিলেবাস অনুযায়ী চা গাছের রোগ দেখাতে হলে ছাত্রদের নিতে হবে সিলেটে। শহরাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্ররা ধানের রোগ, পাটের রোগ কোথায় দেখার?

দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল অবস্থা দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছি। আলাপ হয়েছে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেল, প্র্যাকটিক্যাল না জেনেও ছাত্ররা কখনো ফেল করে না। সেটার 'বন্দোবস্ত' আছে। রয়েছে ছাত্র অভিভাবকদের আলাদা বাজেটও। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল, শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে রয়েছে অলিখিত সমঝোতা। শিক্ষকদের একাংশ কন্ট্রাক্ট নেন ছাত্র পাস করানোর। গ্রামাঞ্চলেই এ প্রবণতা বেশী।

(৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ল্যাবরেটরী নেই, বই নেই, শিক্ষক নেই—বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

রায়দক্ষিণ কোহিনূর হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ফার্স্ট বয়ের নাম আহসানউদ্দিন। বললো আমার গাইড আছে ৬টি। আরো যোগাড় করব। স্কুলের লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানবিষয়ক বই আছে। কোনদিন পড়ি না, দরকার হয় না।

সিঙ্গাইর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষিকা রহিমা খাতুন। তিনি জানালেন, বিজ্ঞানের সিলেবাস এত বড় যে, সারা বছর পড়িয়েও তা কভার করা সম্ভব না। দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক মন্ডলী, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। দেখা যায়, বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও অনাধুনিক, অস্বচ্ছ। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিবাদী চিন্তা চেতনা, পর্যবেক্ষণ অনুশীলনের মানসিকতা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ নেই। দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত জ্ঞানার্জন মুখ্য নয়। সহজে ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষা পাসের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষা।

দেশের বেশ কিছু স্কুল কলেজ সরেজমিন দেখে বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তা কমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞানে পড়ে শতকরা ২৫ ভাগেরও কম ছাত্র-ছাত্রী। মানবিক শাখায় বাকী ৭৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। দেশের অগ্রগতি দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই আনুপাতিক হার উল্টো হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর সত্যসন্ধানী দিকটি সম্পর্কে বেশীরভাগ শিক্ষার্থীই নিরাসক্ত। বিষয়কে গভীরভাবে আত্মস্থ করার বদলে মুখস্থ বিদ্যারই জয়জয়কার। বিজ্ঞান উপলব্ধি করার চেয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর ঠোঁটস্থ করা, মূল বইয়ের চাইতে 'গাইড' গলাধঃকরণই শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যেও বিজ্ঞানচেতনার প্রচন্ড অভাব। দেশের সকল সরকারী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের মোট সংখ্যা ২৩ হাজার ৬শ। এর মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার ৭৮১। অর্থাৎ পরিবর্তমান পাঠ্যসূচীর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত শিক্ষক ৫০ শতাংশেরও কম।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা সেমিনার, মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রচুর। এসবের সুপারিশ মালায় চমৎকার কিছু প্রস্তাবনা থাকলেও খুব সামান্য অংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশে কোন বিজ্ঞাননীতি নেই। স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে বিজ্ঞাননীতি প্রণীত হলেও তা বাস্তবের মুখ দেখেনি।